ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের উত্তরাধিকার ও রণবীর পুরকায়স্থের গল্পবিশ্ব

রণবীর পুরকায়স্থের পাঁচটি গল্প সংকলন হল 'বোকা কাশীরাম কথা' (২০০১), 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা' (২০১১), 'আসমান জমিন কথা' (২০১১), 'শিকড়ের সন্ধানে', (২০১১), 'হেড়ম্বপুরের প্রীতি কথা' (২০১৩)। তাঁর এই গল্প সংকলনের গল্পগুলি পড়ে বোঝা যায় লেখকের গভীরতা ও ব্যাপ্তি অসামান্য। তাঁর কয়েকটি গল্পে বাস্তবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজাল রয়েছে। তাঁর গল্পে রাষ্ট্র-সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যক্তিগত কোনো কিছুই বাদ দেননি। তাঁর লেখায় গ্রাম, শহরের চরিত্র ফুটে উঠেছে। লেখক ব্যাঙ্ক চাকরির সূত্রে অনেক অঞ্চলে বদলি হয়েছেন। এই বদলির ফলে তাকে অনেক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাই তার গল্পে নগর ও গ্রামের জীবন ঘুরে ঘুরে এসেছে। তাঁর গল্পের বয়ান এসেছে দীর্ঘ দিনের জমে ওঠা জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ফলে। তাঁর গল্পে শুধু বরাক উপত্যকার কাহিনি নয়, রয়েছে কলকাতার মহানাগরিক জীবনের চিত্রও। তবে বাংলা সাহিত্য কলকাতাকেন্দ্রিক নয়, রয়েছে কলকাতার মহানগরিক জীবনের চিত্রও। তবে বাংলা সাহিত্য কলকাতাকেন্দ্রিক হলেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসাম ও ত্রিপুরায় বাংলা গল্প চর্চা হচ্ছে। গল্পের মধ্যে দিয়ে রণবীর পুরকায়স্থ বড় সত্যকে উৎঘাটন করেন। তাঁর ছোটগল্পের প্রতিটি লাইনের মধ্যেই যে অর্থ লুকিয়ে থাকে। পড়া দ্রুত হলে কোন অর্থ বাদ পড়বে বলে মনে হয়। তাই পাঠককে একটু সচেতন হয়ে তার গল্পগুলি পাঠ করতে হয়। তার গল্পে যেমন নানা ইঙ্গিত দিয়েছেন তবে সব কিছুর মধ্যে একটা বাস্তবতা আছে। তার গল্পে

গভীর অনুভূতি জাগায়। তার প্রতিটি গল্পে নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান দেয়। একের পর এক গল্পগুলিতে নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করেছেন। তিনি এক জায়গায় দাড়িয়ে গল্পগুলি রচনা করেননি। তিনি গভীর তথ্য সহযোগে গল্পগুলি লেখেন। তিনি নিজের জগৎ ও নিজের পর্যবেক্ষণ করে গল্প লেখেন। তাতে তার একটুও ক্লান্তি নেই। তাঁর যে গল্প সম্পূর্ণ তার নিজস্ব কল্পনায়, নিজস্ব কৌশলে রচিত। স্বপ্না ভট্টাচার্যের লেখা 'উজান' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থে। এই গল্পের মূল বিষয় হল ক্ষিতীন্দ্র মোহনের অতীত থেকে বর্তমানে সঞ্চয়ন। এই গল্পে ফুটে উঠেছে সিলেটি উপভাষা, লোকশ্রুতি অনুপুঙ্খ এবং উদ্বাস্তু জীবনের বাস্তব চিত্র। তবে দেখা যায় রণবীর পুরকায়স্থের গল্প গঠনে নতুন নতুন কৌশল। রণবীর পুরকায়স্থের লেখা 'ওদের কথা' গল্প 'শতক্রতু' (শরৎ ১৪১৬) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি আবার 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা' গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও মিথিলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'বরাক কুশিয়ারার গল্প' গ্রন্থেও প্রকাশিত হয়। গল্পকার দেখিয়েছেন বাংলা সাহিত্য যেমন কলকাতাকেন্দ্রিক তেমনি সংগীত শিখতেও কলকাতা যেতে হয়, তাই সুহাস রবীন্দ্র সংগীত শিখে এসেছে কলকাতা থেকে। সুহাস নজরুল, তালাত মামুদের গান, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান এবং লোকগান গায়। গল্পকথক মিত্রা বৌঠানকে ভালোবাসতো, তেমনি রীনাকেও ভালোবাসতো, তার স্বভাব ছিল নারী দেখলেই প্রেমে পড়া। মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ বলে গল্পকথকের স্ত্রী রীনার সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে ছিঁড়ে যায়নি। বিশ্বায়নের যুগে মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিকতায় এসেছে প্রবল জোয়ারের ঢেউ। ভোগ মানসিকতা মানুষকে আজ অবক্ষয়ের দিকে নেমে গেছে। কিন্তু নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষরাও ভোগ সর্বস্বতা বেশি করে চোখে ধরা পরে। 'নৌকাবিলাস' গল্পে লেখক এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। এতে দুটি নর-নারীর প্রেমের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তাদের ধর্ম স্বতন্ত্র। ধর্ম স্বতন্ত্র থাকার

জন্য তাদের প্রেম মাঝপথে ফাটল ধরেছে। তাই লেখক দেখাতে চেয়েছেন ধর্ম থেকে মানবিক ধর্ম অনেক বড়। মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলে কোন সংঘাত বা জটিলতার আশ্রয় পায় না।

'কিচ্ছা' গল্পটি রণবীর পুরকায়স্থের নতুন শিল্পসৃষ্টি। গল্পটি শুরু করেছেন লোককথা দিয়ে—

''শুনেন একগা কিচ্ছা কই
গাংকে গাং পানিকে পানি
শুনেন একগা কিচ্ছার হেঁকানি
না দেইখাছি নয়ানে না শুইনাছি কানে
সত্যমিথ্যা আল্লায় সে জানে।'' [১]

এই ছড়ার মধ্যে দিয়ে গল্পের ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। তাহলে 'ছড়া' বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করা হলো। সংস্কৃত শব্দ 'ছটা' থেকে 'ছড়া' শব্দটি এসেছে। আদিম কবিতা হলো ছড়া। এক কথায় বলতে গেলে ছড়া হল ছন্দোবদ্ধ পদ পরম্পরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে— ''এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তন অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র।''[২] ওয়ালিক আহমেদ 'বাংলা লোকসাহিত্য ঃ ছড়া, গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন— ''শঙ্খের ভিতরে যেমন সমুদ্রের কল্লোল ধ্বনি শোনা যায়, ছড়ায় তেমনি জাতির হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়।'' দেখা যায় ছড়া শুধু মানুষকে আনন্দই দান করে না তার মধ্যে দিয়ে লোকশিক্ষাও দেয়। লোক জীবনের অনেক তথ্য ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই ছড়ায় মানুষের আচার-প্রথা-বিশ্বাস, জীবন ও জীবিকার কথা, ব্যক্তিগত জীবনের কথাও প্রকাশিত হয়।

এই গল্পের অন্যতম চরিত্র হল লালনকৃষ্ণ। তিনি ছিলেন নারী প্রগতিবাদীর

লেখক ও রসিক মানুষ। পরীক্ষিত পুরকায়স্থ রূপকথার মাধ্যমে বরাক উপত্যকার কথা বলেছে— ''এক যে আছে দেশ। সেই দেশের মানুষ কথা বলে বাংলায়। ওরা সিমকে বলে উরি, কুমড়োকে বলে লাউ, মোচাকে থোড়, হিঞ্চেকে হেলাইঞ্চা। ওরা গৃহপালিত পশুকে আপনি আজ্ঞা করে।''[৩]

এই অঞ্চলের মানুষ বাংলায় কথা বললেও কিছু আঞ্চলিক শব্দও ব্যবহার করে। সেই অঞ্চলের মানুষ, মানুষ ছাড়াও পশুকেও সম্মান দিয়ে কথা বলে। তবুও লালনকৃষ্ণ পরীক্ষিতের কথা শুনে সেই দেশে যেতে চান না। লালনকৃষ্ণ লডিম দেশে যেতে রাজি নয়। কারণ হিসেবে জানায় যে দেশের নারীদের সম্মান নেই সে দেশে যাবে না। কিন্তু পরীক্ষিত পুরকায়স্থ দমে যাওয়ার পাত্র নয়, মহানগরের অনেক মানুষ দেখেছেন তারা মুখেই বড় বড় কথা বলে— কাজ করে দেখান না। লালনকৃষ্ণ বিয়াল্লিশ বছরে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছে। তার সবগুলির বিষয় আলাদা আলাদা হলেও নারীবাদী। তার লেখায় উঠে এসেছে মুসলমান সমাজের নারীনির্যাতন ও লালনকৃষ্ণকে প্রশ্নের উত্তরে বলেন— ''মৌলবী সার আদর করে ডাকতেন লালন। কৃষ্ণ আমার গাত্রবর্ণ। বিশ্বাস আমার শিকড়, আমার ধর্ম।''[৪] লালনকৃষ্ণ একজন গ্রামের মানুষ ছিলেন। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজের বাস্তব চিত্রতুলে ধরেছেন লেখক।

রণবীর পুরকায়স্থের অনেক গল্পেই লৌকিক উপাদান রয়েছে। সাহিত্যের মধ্যে আমরা একটি অলিখিত বিষয় পাই সেটি গ্রামীণ বা লোক সাহিত্য নামে পরিচিত। এই বিষয়টি সাহিত্যে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুক্তি ঋণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে— ''গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশে স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণ রূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেই

উপভোগ্যও আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল-ডাল-পালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলোর তুলনা হয় না তবু তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"[৫] লেখকের গল্পে লৌকিক উপাদান সহজাত ভাবে এসেছে।

রণবীর পুরকায়স্থের গল্পপাঠ নতুন নতুন মোহনার দিকে যাত্রা করে আরো একবার নতুন উৎস থেকে শুরু করার জন্য। তিনি কেন্দ্র ও পরিধির দ্বিবাচনিকতার জোর স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেন। তার গল্পে ও সময়ের বিচিত্র ছবি দেখতে পাওয়া যায়। স্থান ভেদে লেখকদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির গুরুতর পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। লেখক লোকায়ত অনুপুঙ্খের পুনরাবিষ্কার, কালসঙ্গতিবোধ ও ঐতিহ্য ভাবনার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে লোক ভাষা ও মাটির সোঁদা গন্ধ নিয়ে আসেন কথা বয়নে। সেই সঙ্গে সমাজের অবচেতন প্রথিত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মাত্রার সঞ্চারণ প্রতিফলিত করেছেন গল্পের প্রতিবেদনে। তিনি গল্পের ভাষা লোকায়ত চলন এবং সেই চলনের ঐতিহ্যের সংশ্লেষণ ও ধারাবাহিক রূপ পাঠকৃতির গ্রন্থনাকে পরপর নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তিনি সময় চেতনা ও সমাজকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে নতুন ভাবে উজ্জীবিত করেছেন। তিনি গল্পের কথকতার চিরাগত ধারণাকে আমূল পাল্টে দিয়েছেন। তাঁর গল্প পাঠে স্তরে স্তরে আবিষ্কারের আনন্দ প্রকাশ পেতে থাকে। তার গল্প একটু করে লেখকও তার আদি বয়ান সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা সরে যায় অন্তরালে। পাঠক জেগে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত গল্পের বিষয়কে কর্ষণ করে বের করে। এক স্বতন্ত্র পাঠকৃতির শস্যসম্পদ।

রণবীর পুরকায়স্থ গল্পবয়নে আসামের বরাক উপত্যকার উপভাষাগত

বিশিষ্টতাই নয় শুধু, প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালিদের জীবনে অর্জিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস প্রতিন্যাসও প্রতিফলিত হচ্ছে তার ছোটগল্পগুলিতে। স্বাভাবিক ভাবেই আজকের গল্প পাঠক অনেক বেশি সচেতন, অনুসন্ধিৎসু, পরিশ্রমী ও অনুভূতি প্রবণ হতে হচ্ছে।

সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে গতিশীল ধারা হল ছোটগল্প। ছোটগল্পে সমাজের যে অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার প্রকাশ করে সমাজ যখন কোন লক্ষ্য বা মীমাংসার কোন পথ দেখাতে পারে না তারই প্রতিবেদন হল ছোটগল্প। গল্পকার যতটুকু দেখতে পান ততটুকুই গল্পে তুলে ধরেন। টুকরো টুকরো ঘটনাও ছোটগল্পে স্থান পায়। তাই নাদিন গোর্ডিমারের একটি চমৎকার মন্তব্য করেন : "It is an art from solitary in communication; yet another sign of the increasing loneliness and isolation of the individual in acomcetitive society?" গল্পকার হাসান আজিজুল হক একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন— ‘‘যখন লেখক মানসিকভাবে আর সাড়া দিতে পারেন না তখনই তিনি আর বদলান না। তখন যেভাবে লিখে তিনি সিদ্ধ অর্জন করেছেন সেটাকে আর ত্যাগ করেন না। তিনি সেই ভাবেই লিখতে থাকেন। হতে পারে সে, ত্যাগ না করা সত্ত্বেও তাঁর সেই কর্মই আরও বহুদিন হয়তো তাঁর কাজ চালিয়ে দেয়। কিন্তু আমার জীবনে সেটা হয়নি। আমার কেবলই মনে হয়েছে নিরন্তর একটা প্রবাহের মধ্যে আমি আছি। মানুষ হিসেবেও আমার প্রতি তুলনায় যে বাস্তবের মধ্যে রয়েছি সে বাস্তবও ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই কাজেই দুই দিক থেকে পুরোটাই হচ্ছে একটা পরিবর্তনের ব্যাপার। সব সমাজ এবং সমাজের ভিতরের বাস্তব নিজ পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে এবং নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি হিসেবে আমি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। লেখক হিসেবেও ঠিক একই পরিবর্তনের স্রোত আমার ভিতরেও আছে। আমি, এক পরিবর্তনশীল

লেখক এক পরিবর্তনশীল— সমাজের সম্মুখিন হচ্ছি। ফলে লেখাটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার কথা তো চলতেই পারে না। সবই বদলাবে এবং যে দিন এই পরিবর্তনশীলতার ভিতরে থাকতে পারবো না আমি মনে করবো যে লেখক হিসেবে কাজও আমার সেই দিনই একরকম করে শেষ হয়ে যাবে। আর লেখার দরকার হবে না।" (১৯৯৩ : ৬৪)

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়কে চিনে নিয়ে গল্পকার তার কথন বিশ্ব গড়ে তোলেন। সমাজের বাস্তবকে ভাঙতে ভাঙতে নতুন করে গড়ে তোলেন এবং গল্পবীক্ষার বদলও করেন। গল্পকার যে পরিমাণ বদল করেন তা আবার নতুন করে রূপান্তরিতও করেন। ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় সময় ও পরিসরের দ্বিবাচনিকতা। আবার ছোটগল্পের বয়ানের ভাষা সর্বদা সত্যকে প্রকাশ করে না, অনেক সময় সত্যকে আড়ালেও রাখে। তাই এ বিষয়ে হাসান আজিজুল হক বলেছেন— ''যে মানুষ মগজে ব্যাকরণ কষে বাক্য তৈরী করতে পারে, সে নিজেকে ইচ্ছে হলে আড়াল করতে পারে— ইচ্ছে করলে নিজেকে অন্য মানুষ হিসেবেও দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এই রকম গড়ে তোলা মানুষ, আসল মানুষের মাঝখানে এসে হাজির হয়ে যেতে পারে। লেখক হিসেবে কারো এরকম মনে হতে পারে যে আধুনিক মানুষ, শিক্ষিত মানুষ কখনো কখনো নকল মানুষ যদি নাও হয় অন্তত নির্মিত মানুষ, একটু দূরে এবং ঠাণ্ডা। তুলনায় কোনো একটা উপভাষায় কথা বলা মানুষ হাড়ে মজ্জায় জ্যান্ত।"

উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙালিরা রয়েছে ভিন্ন পরিসরে। স্বাধীনতা তাদের কাছে বাস্তুহীন। একটিই ছিল অপরাধ তারা বাঙালি বলে, বাঙালি হওয়ার জন্য তাদের কোনো দেশ থাকলো না। আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় কোথাও তাদের স্থায়ী ঠাঁই হয়নি। বরাবর তাদের ঘর পুড়েছে, পুড়েছে বিশ্বাসকেও। একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন যেমন বাংলাদেশে প্রতীক হয়ে ওঠে তেমনি উনিশে মে প্রতীক

হয়ে উঠে আসামের বরাক উপত্যকা। স্বাধীনতা দেশভাগ গণতন্ত্র প্রভৃতি চলছিল দেশে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে গল্প লিখেছেন রণবীর পুরকায়স্থ। সার্থক ছোটগল্পে থাকে বাচন ও পরাবাচনের দ্বিরালাপ। বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হয় গল্পকারের কল্পনায় ও দক্ষতায়। গল্পের ভাষা কখনই গল্পের বিবরণ দেয় না, তার মধ্যে ফুটে উঠে স্ফুট ও অস্ফুট ইশারা। ছোটগল্প হলো এক জীবনদৃষ্টি। এই গল্পবীক্ষা পাল্টে দিচ্ছে ভাষাবিশ্বকে। ছোটগল্পে প্রতীকবিশ্বকে দেখতে পায় উপযোগী দ্রষ্টা চক্ষু। যেমন ইলিয়াস লক্ষ করেছেন— ''গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনের মচ্ছব চলে, সেখানে ব্যবস্থা এমনই মজবুত যে কোটিপতি ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই যে নির্বাচিত হয়। দফায় দফায় গণ আন্দোলনে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী প্রাণ দেয়, রাষ্ট্রের মালিক পাল্টায় ফয়দা লোটে কোটিপতিরা। রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য গ্রামে পর্যন্ত টেলিভিশন পর্দায় আমেরিকানদের সাম্প্রতিক জীবনযাপন দেখে, সেখানকার মেয়ে পুরুষ সব তীব্র গতিতে গাড়ি চালায়, রকেট ছোঁড়ে, তাদের একটি প্রধান চরিত্রের নাম কম্পিউটার, তার কীর্তিকলাপ ও বিস্তারিত দেখা যায়। বাড়ি ফিরেই চাষী পায়খানা করে ডোবার ধারে, ডোবার পানি সে খায় অঞ্জলি ভরে, টেলিভিশনে মস্ত করিডোরওয়ালা হাসপাতাল দেখে মুগ্ধ চাষী বৌ ছেলে মেয়ের অসুখ হলে হাঁস-মুরগি বেঁচে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছে শোনে যে ডাক্তার সাহেব থাকলেও শোনে যে এখানে ঔষধ নেই। তখন তার গতি পানি পড়া ইমাম সাহেব।" (১৯৯৭ : ৬১)

লেখক রণবীর পুরকায়স্থের গল্প-উপন্যাস নির্মাণে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা রয়েছে। 'তাঁর লেখায় শিল্পভাবনা, সাহিত্যদর্শন ও জীবনবোধের স্বাক্ষর মেলে।' তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি এখনো বিভিন্ন বাংলা সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত। বর্তমানে বিভিন্ন পাঠের অভিজ্ঞতায় তাঁর শিল্পভাবনা ও প্রকাশভঙ্গি নতুন নতুন রূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর তাঁর এই

লেখক সত্তা স্বচ্ছন্দে চিনে দিতে পেরেছে এই স্বদেশকে। তাঁর এই স্বদেশ বরাকভূমির চিত্র বা মাটির ঘ্রান সাহিত্যে ঘুরে ফিরে এসেছে বার বার। বরাক উপত্যকার ''শ্রেণি-বর্গ-বর্ণ-বিভাজিত'' সমাজ জীবনকে তুলে ধরেছেন। তিনি সমাজের দৃশ্য ও অদৃশ্য কলঙ্কের চিহ্ন তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সমাজ কিভাবে শোষিত ও বঞ্চনার স্বীকার হয়েছে তাও তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। তিনি দেখিয়েছেন বরাক উপত্যকার সাধারণ মানুষের বাঁচার সংগ্রাম ও নতুন করে স্বপ্ন দেখা। সেই সঙ্গে তুলে ধরেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভণ্ডামি ও দুর্নীতির ছবি গুলি। লেখক রণবীর পুরকায়স্থ মানুষের গহন মনের রহস্য উদ্‌ঘাটন প্রকাশ করাই তার লক্ষ্য। তিনি নিজের মতো করে মানুষের সম্পর্কে নতুন নতুন কথা শুনিয়েছেন এবং মানব জীবনের গোপন সত্য খুঁজেছেন। কথা সাহিত্য হল মানুষের জীবন যাপনের ভেতরের স্পন্দন ও অনুভূতি প্রকাশ করা।

লেখক রণবীর পুরকায়স্থের একটি অন্যতম গল্প হল ''ইচ্ছাকলি''। এই গল্পটি 'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা'' গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে গুয়াহাটিতে ভিকি পাবলিশার্স থেকে। এই সংকলনের তৃতীয় গল্প হল ''ইচ্ছাকলি''। এই গল্পের নামকরণের মধ্যেই চরিত্র দু'টি ফুটে উঠেছে। ইচ্ছা হল পুরুষ চরিত্র আর কলি হল নারী চরিত্র। ইচ্ছার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের পরিচয় পাই না। তবে তিনি যে পাটনির ছেলে সেই পরিচয়টুকু মাত্র পাওয়া যায়। সে বড় ধরনের মাছুয়া নয়। তবে তার চরিত্রের ধরণ একটু আলাদা। সে মাছ ছাড়া এক বেলা খেতে পারে না, কিছুটা অহংকারি ভাবও আছে। তাই ইচ্ছা মাঝি বলে,

''— আমি আইলাম দুধপাতিল ঘাটর কাড়ারি। পাটনির বেটা পাটনি আমি। আমার উঠান অইল গাঙ। অউ কালো পাথর ইখানের নীচের যত মাছ

আছে, যত কিছিমর আছে, সব আমার। হাবুই গাঙ হিচলেও পাইতায় নায় ইলাখান মীন।”[৬]

ইচ্ছা মাজি বাস করতো দুধপাতিল। তবে শিবুর সমস্ত মাছের যোগ দিতো ইচ্ছা। শিবুর বয়স ইচ্ছার বাবার সমান। কিন্তু তাকে লেংটা বেটা ডাকে আবার শিবুদাও ডাকে। কিন্তু ইচ্ছা তাকে পিতার মতো সম্মানো জানায়। ইচ্ছা বলে,

‘‘— তুমি বেটা নৌকা বাইতায় কিতা? অখন তুমি বাড়িত থাকতায়, বুড়া অইছ নানি? কলা, কয়ফল, কাকরুল, ঝিঙা আর উরির গাছ লাগাইবায় বিচরাত। পানিউনি দিবায়। বাশর করুল ঢাকি দিবায় ঢুকরি দিয়া, উদলাইয়াও দিবায়। রান্দবায় মাছর ভাজা কড়ু ঝোল চচ্চড়ি, আমি খাইমু নানানি বিনানি রান্দা তোমার হোটেলো। মাছ দিমু মাঙনা, পয়সাও দিমু যেতা পাই আধাআধি। আইচ্ছা আমার লাগত নায় আধা, তুমি রাখি দিও সব আমার নামে। বারুণির মেলাত যখন যাইমু চৈত্র মাসো তখন দিলাইও। দিও কিন্তু।”[৭]

ইচ্ছা মাঝি বড় মাছুয়া না হলেও গল্প বলার সময় একটু বাড়িয়ে বলতে ভালোবাসে। সে বলে,

‘‘— কানি পাবিয়া ধরলাম আইজ দেড় আলি, ছয়টা। অউ অলা ঝলঝলা।”[৮] সে মাছের আকারকে বড় দেখাচ্ছে যে বোয়ালকেও হারমানায়। তবে সে সিদ্ধহস্ত ছিল পুঁটিমাছ ধরায়। পুঁটি মাছ দিয়ে ভরে ফেলে তার খলুই। বঁড়শি আর গামছা দিয়ে যে শুধু পুঁটি দাঁড়কিনা, গুতুম, আর বালিগড়া ধরে তাতে তার কোনো দুঃখ নেই। তাছাড়াও সে মাঝে মাঝে পাবিয়া, টেংরা, বাচা মাছও ধরে। তবে এই সব নিয়ে কেউ কথা শোনালে মহিমা কীর্তন করে শুনিয়ে দেয় কয়েক কথা। সে বলে—

"— কত কিছিমর পুঁটি ধরলাম আইচ। তেরিপুঁটি কতটা উঠাইছলাম গামছাত, লই গেল গি কাছিমর পুড়িয়ে। ভারি পুটি ডিমাল আছিল, লেংটা বেটায় রান্দরা চড়চড়ি, পুটার আইর ভাজা, বাক্কা অতটা মনা মাস্টাররে দিয়া আইলাম। কাঞ্চন পুটি পাইছলাম একেবারে সোনার বর্ণ দিলাম সোনা পিররে। জানি, পিরে কুনু অতততা খাইন নি, কাটিয়া কুটিয়া কলিয়ে নিবা কয়েকটা। তাইন অউত্তো রান্দবা। আর তিতপুটি কুনু খইন নি মাইনষে, গামছার হেরে দি বার অই যায়। তেও রাখছি, খাইব নে আমার বিলটুরিয়ে।"[৯]

নদীতে মাছ চুরি হওয়ার ভয় নেই কারণ ইচ্ছা মাঝি সততার সঙ্গে পাহাড়া দেয়। এতে ইজারাদার নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। তাই ইজারাদার তাকে বড় মাছ দিতে চায় কিন্তু সে নেয় না। সে বলে, "— আমি নিয়া কিতা করতাম। কাওয়াইতাম কারে? বিয়া করলে দেইন যে।"[১০] সে এখন বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছে। সোনা পিরের কাছে একটি মেয়ে থাকে তাকে ভালোবাসে ইচ্ছা। কিন্তু কলিকে নিয়ে ইচ্ছা মাঝির সঙ্গে শিবুদার মতের বিরোধ বাঁধে। শিবুদা তার বাবার বয়সি হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন না। কলি ইচ্ছার কাছে মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু এটাও পছন্দ করছে না মনা মাস্টার। ইচ্ছার মধ্যে যে বিয়ে করার প্রবল ইচ্ছাকে কেউ মূল্য দিতে পারছে না। আর এতেই তার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠছে। একদিন ইচ্ছা বারুনির মেলা থেকে এসে জ্বরে পড়েছিল তখন শিবুদা ও কলি— তারা শুশ্রুষা করেছিল। তাই কলির সেবা যত্ন সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই। নিসঙ্গতা ভুলার জন্য কলিকে তার পাশে রাখতে চেয়েছিল।

ইচ্ছা মাঝি উদার ব্যক্তি ছিলেন। সে তার মায়ের মাসির হাতে এক হালি সপরি কলা দিয়ে তার পায়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেয়। তার বন্ধু খলিলের নাম করে এক বান বিড়ি কেনে। ইচ্ছা দুধপাতিলে বিড়ি পান করবে না কারণ সে তখন নিজের এলাকায় ছিল। সে সামাজিক মর্যাদায় সচেতন। তাই খলিল বন্ধুকে

বলে,

"— তোর নামে বিড়ির বান, কিনি লইলাম। অখন খাই একটা। এর পরে তো আর পারতাম নায়। সব বড় বড় মানুষ।" ইচ্ছা তার বিয়ের জন্য বন্ধুর কাছেও সাহায্য চায়। বলে, "— কিতা বে কলির লগে দিতা নায় নি বিয়া? গাউআলা হকলে কিতা কইন? কলি বাঙাল, মুছরমান নানি? এক পিরর বাড়িত থাকে এর লাগি নি অই গেল বাঙাল? বোবা বেটার বোবা পুড়ি। গুঙার আবার কিওর ধর্ম ক?"[১১]

মাঘ ফাল্গুন মাসে দুধপাতিলে এক বিভ্রাট ঘটে। পঞ্চায়েতি পুকুরের মাছ মরতে শুরু করে রোগে। সেই মাছ খাওয়ার নিষেধ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ইচ্ছা মাঝি তা মানতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু মনা মাস্টারও তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। ইচ্ছা কলির কথা ভেবে সে দুশ্চিন্তায় ভুগছে। তাই কলিকে বলে, "— খাইও না গো। মাস্টারে না করছইন। তুমার কিছু অইলে আমি কিতা করমু?"[১২]

ইচ্ছা এক মাস আগে থেকেই বারুনি মেলায় যাবার জন্য প্রস্তুতি নেয়। সেই মেলায় যাবার জন্য তার মনের ভিতর গোপন বাসনা ছিল, কলিকে নিয়ে মেলায় ঘোড়ার। কলিকে কিনে দিতে চেয়েছেন এক বোতল আলতা, হাতভর্তি কাছের চুড়ি আর একটা লালরঙের সুতির শাড়ি। কলির কথা জানিয়েছিল মনা মাস্টারকে কিন্তু মনা মাস্টার তা সায় না দিয়ে 'রায়ট লেগে যাওয়ার ভয় দেখায়'। ইচ্ছাকে সোনা পির স্নেহ করে। ইচ্ছার মনে এসব কথা জানলে পরে কি হবে এই ভেবে সে দুশ্চিন্তায় পড়ে। এতে তার মনে উগ্রভাবের পরিচয় দেখা যায় না। সে চায় সব কিছু সমঝোতার মধ্যে দিকে হোক। ইচ্ছা কলিকে বলে,

"— তুমিও গো মাই, এমনে তো দেখি কিচ্ছু ডরাও না। জ্বরজারি

অইলে কততা করো, ভালোমন্দ রান্দলে আমারে না দিয়া খাওনা, আমার কিতা জাত নাই নি? লেংটা বেটায়ও কইছইন তুমার হাতে খাইলে জাত খাইব। কইলাম চলো মেলাত যাই, না যাইতায় নায়। বেটিনতর অউ এক রগ তেড়া আর ভেড়া। কইলাম বিয়া করি, কিচ্ছু মাতো না। ই বার দেখবায় নে সাধুয়ে দিবা তাবিজ, তখন দেখি না করো কেমনে?"[১৩] ইচ্ছাকে জাতের ভয় দেখালেও কলির কাছ থেকে সে দূরে সরে যেতে চায় না। সে তাকে ভালো বেসেছে, সে জাতের বিচার করে না, মানুষ হিসেবে দেখেছে।

সিন্টেং সাধু খামসিনের সঙ্গে ইচ্ছা মাঝির পরিচয় বেশি দিনের নয়। খাসিয়া সাধুদের এক দলে ছিল খামসিন। তার মুখ দিয়ে যখন কাছাড়ি কথা বের হচ্ছিল তখন তার কথা শুনছিল। তখন তার মনে পড়ে গেল বিল্টুরি আর ছেবলির ঝগড়ার কথা। বিলটুরি হলো হুলো বেড়াল আর ছেবলি হল মিনি বেড়াল। হুলো আর মিনি প্রায় সময়ই ঝগড়া করতো আর ইচ্ছা মাঝি জল না ছিটালে ঝগড়া ভাঙতো না। মনা মাস্টারের কাছে হুলো ও মিনির সমস্যার কথা জানালে হেসে উড়িয়ে দিতো। তাই সে নিরুপায় হয়ে খামসিন গুরুকে একথা জানায়। খামসি সোওয়া টাকার মাধ্যমে একটি তাবিজ দেয় সেই তাবিজ বিল্টুরির গলায় বেধে দেয়। আর ইচ্ছা মাঝি দেখে সত্যি সত্যি বিল্টুরির সঙ্গে ছেবলির ভাব হয়েছে। তাবিজ কতটা কাজ করেছে সেটা বিষয় নয়, তবে ইচ্ছার মনের প্রবল আকাঙ্খাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

ইচ্ছার নাম কে রেখেছিল কেউ জানে না। কারণ তার আত্মীয় স্বজনের পরিচয় অজ্ঞাত। অপর দিকে কলি নামের মেয়েটি তারও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কলি সোনা পিরের কাছে থাকে। সে কোথা থেকে এসেছে তাও কেউ জানে না। তাকে সকলেই 'ওই' করে ডাকত। কিন্তু পির সাহেব তাকে কখনও অবজ্ঞা করতো না। কিন্তু ইচ্ছা এই মেয়েটির নাম রাখে কলি বলে। ইচ্ছা

মেয়েটিকে কলি ডাকলে— সারা দেয় হাসি মুখে।

গোবিন্দ দাস ইচ্ছাকে মাসিমনির ঠিকানা দিয়েছিল। গোবিন্দ দাসের বাড়ি ফুলবাড়ির অনেক ভিতরে আপাঞ্জলি গ্রামে। তিনি ছিলেন একজন চাষি মানুষ। তার ডাক নাম পিং। তিনি লাকড়ির মতো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলায় তার পিং নামটি হয়েছে। তিনি বারুনি মেলায় জিলিপির দোকান দেন। ইচ্ছা পিংকে সাহায্য করেন বিনা মুজুরিতে এবং পিং এর সঙ্গেই রাতে ঘুমায়।

ইচ্ছাকে কেউ সাহায্য করছে না বিয়ে করার ক্ষেত্রে। তাই সে খামসিনের সাহায্য চায়। ইচ্ছা বলে,

''— আমার আর কলির বিয়া করাই দেও না কেনে? পাথুর উথুর যদি থাকে তোমার পাহাড়ো লইয়া আইও আগরবার। বড় পাথুর আনিও। অউ নেও আমার কাছে যত টেকা আছে সব নেও। সব তুমার। আলতা চুড়ি শাড়ি ইতা পরে কিনমুনে। আনবায় নি সাধু?"[১৪]

ইচ্ছার সমস্ত সঞ্চিত ধন খামসিন পকেটস্ত করে নেয়। ইচ্ছাও জানে যে সে পাথুরে কোন কাজ হবে না, বুজরুকি। কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে জড় পদার্থ পাথুরকে আকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছে। এখন তার কাছে মানুষ অপ্রয়োজনীয়। তাই পাথর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উপকার করতে পারবে বলে ধারণা। পাথর কারও কোনো ক্ষতি করতে পারে না বা কাউকে ভয় দেখাতে পারে না।

'মামুলি অশান্তি' গল্পটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। পল্লব সেনগুপ্ত হল মফস্‌সলের মানুষ। সে রিকশার ভাড়া ঠিক না করে রিকশায় চড়ে ছিল। ভেবে ছিল রিকসা ভাড়া নেবে উর্দ্ধে তিন থেকে চার টাকা কিন্তু রিকশাওয়ালা তার কাছে চেয়ে বসে দশ টাকা। এতে সে বিরক্ত হয়ে টাকা দিতে নারাজ। কিন্তু এক শ্রমজীবী জননেতা বলে— ''ফ্ল্যাটে

থাকবে গরিব রিকশাওয়ালাকে ঠকাবে, নাই চলে গা, ঝামেলা পাকাবেন না মশাই দিয়ে দিন, হল্লা হল।"[১৫] তারপর থেকেই সে প্রতিজ্ঞা করে আর রিকশায় চড়বেন না। আসলে মফস্‌সলের মানুষ তাই শহরের নিয়ম কানুন জানা ছিল না। এতে তার স্ত্রী লতার সঙ্গে মতের বিরোধ বাঁধে। কারণ পরের দিনেই পঁচিশটা পুতুলের মাথা নিয়ে যেতে কষ্ট হয় লতার। পুতুল তৈরির জিনিস পত্র এনে দিত রিকশাওয়ালা। স্ত্রী লতা হলেন আধা শহর আইরংমারার মহিলা। সে বাসন মাঝে, দরজা জানালার গ্রিল মোছে, টিভি, ফ্রিজ, গোদরেজ তালায় সেলাই মেশিন, প্যাডেস্টাল পাখায় থ্রি ইন ওয়ান সব একাই পরিষ্কার করেন। পল্লব সেনগুপ্ত অফিসে কাজ করে চলে সে আর অন্য কোন কাজ করে না। তার আট বছরের ছেলে বিপ্লবকান্তি সেনগুপ্ত কোন কাজ করে না। সব দায়দায়িত্ব লতা একা সামলায়। এতে স্বামী স্ত্রীর কিছুটা অশান্তি ঘটে। এছাড়াও রাত্রে মিষ্টিহীন খাবারের জন্য অশান্তি ঘটে।

পল্লব সেনগুপ্ত যে দিন অফিসের গাড়ি পান না সেই দিন বাওয়া পৌঁছে দেন দমদম পর্যন্ত। বাওয়া ও তার সঠিক নাম বলে না। তাকে দেখে রিকশাওয়ালা ভাবা যায় না। তার স্বভাব ছিল মস্তান গোছের। তার কথা বলার মধ্যে একগুয়েমি আছে। কিন্তু পল্লব সেনগুপ্তের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন নম্র ভাষায় কথা বলে। শম্ভু লতার টাকা ফেরত দেয়নি জেনে মেরে দিল সহকর্মীকে সবার সামনেই। অসুস্থ শম্ভুকে টিবি হাসপাতালে ভর্তিও করে দিয়ে ছিল।

বাওয়া আত্মরক্ষা কলোনিতে বাস করে। কলকাতায় নবজীবন ও আত্মরক্ষা কলোনির সংখ্যা অনেক। কিন্তু বাওয়া কোথায় থাকে নির্দিষ্ট করে বলে না। তার স্ত্রী বাদাম ভেজে প্যাকেট তৈরি করে কোনরকম সংসার চালায়। তাই বাওয়া স্ত্রী সম্পর্কে বলে— "কী করবে বলুন। ছেলে মানুষ করে, মাকে দেখে। মা চোখে দেখে না কানে শোনে না।"[১৬] বিন্তি বিন্দিকারখানায় কাজ করে। বিন্তি লতাকে অনেক সাহায্য করেছে। বিন্তি পুতুলের হাত, পা ও বুক সেলাই করে দেয় অল্প

সময়ে। পল্লব বাওয়াকে বশ করতে পারছে না, কারণ সে ছিল চূড়ান্ত বাচাল। পল্লব সেনগুপ্ত বলে ''— এখন কষ্ট দাও কেন, নিয়ে আসতে পার রিকসা করে।''[১৭] এই সব কথায় কান দেয় না বাওয়া। লতা পল্লবকে সাবধান করেছে রিকশাওয়ালা অর্থাৎ বাওয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে। লতা বলে— ''তুমি চেনো না ঐ ইডিয়েটকে। এক পয়সাও দেয় না বাড়িতে। ছেলেকে মারে বৌকে নেগলেট করে। পাশের ঝুপড়িতে রাত কাটায় মদ খেয়ে।''[১৮] আবার বাওয়া পল্লবকে জানায়— ''আমি বড় নিষ্কম্মা মানুষ স্যার। বিন্তি একা মেয়ে মানুষ হয়ে সংসারটাকে ধরে রেখেছে, আমি কিছু করি না।''[১৯] বাওয়ার কথায় পত্নীপ্রেম গভীর ভাব দেখা যায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাটমালিক পল্লব সেনগুপ্ত দিশেহারা হয়ে যান বাওয়া চরিত্র সম্পর্কে। কানে শোনা ও স্বচক্ষে দেখা দুটিকে মেলাতে পারছেন না। বাওয়া অন্যের মদ খাওয়া পছন্দ করেন না। তাই বাওয়া বলে— ''মদ গাঁজার নেশা গরিবের সর্বনাশ ডেকে আনে।''[২০] রিকশাওয়ালা শম্ভুকে মেরে ছিল সে মদ খায় বলে। আবার এও বলে সে মদ খেলে বিন্তি তাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। এমনিতে সে ভালো, নেশা ভাঙ খেলে সে মা মনসার রূপ নেয়। লতার কাছে শুনা কথা আর বাওয়ার কথা শুনে পল্লব সেনগুপ্ত দিশেহারা হন, কোন্ কথা বলবেন ভেবে পাচ্ছে না। বাওয়া সম্পর্কে লতা বলে— ''তাই? দুমুখো শয়তান। বলল না ও কী করে?''[২১] আসলে লতা ও বাওয়া সম্পর্কে দূর থেকে শুনেছে।

পল্লব একদিন স্বচক্ষে দেখল দুশো সাতাশ নম্বর গাড়ি থেকে নামল দুজনে হাত ধরাধরি করে। চায়ের দোকানে পাশাপাশি বসেছে দু'জনে। এই খুশির সংবাদ পল্লব লতাকে জানায়। লতা তা বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ বাওয়া সম্পর্কে তার যে ধারণা আছে তা থেকে সরে আসতে পারছেন না। কিন্তু পল্লব তাজা খবর লতাকে দিতে ভয় পায়। কারণ সে বিশ্বাস করবে না। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তি শুরু করবে। সেই জন্যে পল্লব কিছুদিন

সময় নিয়ে তার পর বলে। বাওয়া স্ত্রী সম্পর্কে বলে,

"— অপদার্থ রিকাশাওয়ালার বৌ হয়ে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

— সারাদিন খাটা খাটুনি। অন্ধ কালা মায়ের দেখাশোনা, ডাকাত ছেলেকে সামলানো।

— এখন হয়েছে মাথা ঘোরার ব্যামো কী যে করি স্যার।

— ডাক্তার বলেছে বস্তির পরিবেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে কিছুদিন। কোথায় যাব স্যার?"[২২]

পল্লব ও লতা নিজের কথা না ভেবে পরের বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তি শুরু করে। পল্লব বাওয়াকে সৎ ভাবে কিন্তু স্ত্রী তার উল্টো ভাবে। পল্লব ও লতা দু'জনের মতের মিল ঘটে না। পল্লবের দিন দিন বিভ্রান্তি বেড়েই চলে। অবশেষে তারা "মামুলি অশান্তির কথা ভেবে হাসতে হাসতে দুজনেই ঘরদোর সামলায়।"[২৩]

বিন্তি চরিত্রটি ও বিন্দিকারখানায় এই দুটি নামের মধ্যে দিয়ে পাঠককে ভাবিয়ে তোলে লেখক। এটাই লেখকের একটা রহস্যময় খেলা। মনে হতে পারে ছাপার ভুল। কিন্তু গল্পটি শেষ করার পর দেখা যাবে ছাপার ভুল নয়, সেটা পাঠকের বোঝার ভুল। এভাবেই গল্পটি পাঠককে বেশি করে ভাবিয়ে তোলে, আরো কিছু জানার জন্য।

'লেবুপাতা করমচা' গল্পটি 'প্রবাহ তিস্তা তোর্ষা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই গল্পটি 'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা' গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়। এই গল্পে প্রধান দুটি চরিত্র চন্দ্রমোহন ও ধরণীধর মাইতি। ধরণীধর মাইতি ছিলেন ঋণ বিভাগের লেজার কিপার ও চন্দ্রমোহন ডেসপ্যাচ বিভাগে চাকরি করতো। চন্দ্রমোহন

নেতাও ছিলেন। এই নেতাগিরির জোরে অফিসে তার কাজ করতে হত কম। তার বেশির ভাগ কাজ করে দিত ধরণীধর মাইতি। কিন্তু এর বিনিময়ে সেও সুযোগ নিত, বেতনের দিন সস্তা দরে চাল, ডাল, নুন, তেলের ব্যবস্থা করে নিত। চন্দ্রমোহনের অবসর গ্রহণের সময় বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান জাকজমক করে হয়েছিল। চন্দ্রমোহন বলে, ''আমি তো ইউনিয়নের কাজে ব্যস্ত থাকি, ধরণীদা আমার কাজে সাহায্য করে দেয়, দিয়েছে এতদিন, এখন কে করে ডেসপ্যাচ? ধরণীধর বলে না কিছুই, বুঝিয়ে দেয় এখনও সে-ই করে।''[২৪]

চন্দ্রমোহন ধরণীধরের উপকার স্বীকার করেছেন। কিন্তু ধরণীধর আগে যেভাবে কাজ করে ছিল এখনো সেই ডেসপ্যাচের কাজ করে দিতে হয়। সে ছিল মিনমিনে, সহজ, সরল, রাগী না হওয়ার জন্যই তার এত দুর্ভোগ, চালাক লোকেরা দুর্বলতার সুযোগ নেয়। চন্দ্রমোহনের বিদায় সংবর্ধনা সভায় চাঁদা ধরেছিল ধরণীধরকে একশো টাকা, তাও দিতে তিনি রাজি নয়। ধরণীধর বলে ''ভাল জননেতা হওয়ার আশীর্বাদ করব।''[২৫] ধরণীমোহনের হাতে একটি পলিথিন ব্যাগ দিয়ে বলে, ''আমার গাছের করমচা, তোমার প্রিয় বলে দিলাম।''[২৬]

ধরণীধর মাইতির অবসর গ্রহণের সময় চলে এলো। শক্তিমান মান্না তার বিদায় সংবর্ধনা করার সময় ধরণীধরের কাছে জানতে চায় সে কি চায়। কিন্তু সে চেয়েছে এক বস্তা চাল, এক বস্তা আলু ইত্যাদি। ধরণীধরের সংবর্ধনা বেশি কিছু জাকজমক করতে রাজি নয়। কারণ সে চন্দ্রমোহনের মতো কোন নেতা নয়।

ধরণীধর মাইতির তিনকূলের মধ্যে হল দুই ভাগ্নে। কৈলাসপতি মণ্ডল তার ডাক নাম কালু, এক পা খোঁড়া একটু মাথা গরম আর অন্য ভাগ্নে বনস্পতি, ডাক নাম বুনো, শিয়ালদহ বোবা কালা স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে এবং বি.এ. পাশ করে বাঁশবেড়িয়া স্কুলের কেরানি।

ধরণীধর মাইতি যখন মারা যায় তখন চন্দ্রমোহন শ্রীমানী নানা কাজে ব্যস্ত। তার কথা মনেই থাকে না, তাকে মনে করিয়ে দেয় শক্তিমান মান্না। ''শক্তিমান মনে করিয়ে দেয়, করমচা। করমচা দিয়ে বাজি জিতেছিল, করমচা দিয়েছিল ফেয়ারওয়েলে।''[২৭] কালু জানায় ধরণীধর তাদের নিজের মামা নয়। কালু বুনো দুজনেই অনাথ। কৈলাসপতি আর বনস্পতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন ধরণীধর মাইতি। ধরণীধর অনাথ নয়, কিন্তু অনাথের জন্য কাটিয়ে দিয়েছেন জীবন। তার আত্মীয় বলতে আমরা এবং গ্রামবাসীরা পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেকে লুকিয়ে রাখে। তিনি উপার্জনের সমস্ত টাকা আশ্রমে দান করেন। তিনি সারাটা জীবন কৃচ্ছ্রসাধনে কাটিয়ে দিয়েছেন, এমন কি চাকরির শেষদিন পর্যন্ত সহকর্মীদের কাছ থেকে চাল, ডাল ভিক্ষে করে এনেছেন।

লেখক রণবীর পুরকায়স্থের রচিত গল্প 'স্থায়ী ঠিকানা'। আমার বাবা সিলেটের অধিবাসী। কিন্তু আমার জন্ম শিলচরে মামার বাড়িতে ১৯৮৩ সালের দুসরা মার্চ। আমার দু'মাস বয়সেই চলে যাই ডিব্রুগড়ে। কারণ বাবার কর্মক্ষেত্র ছিল ডিব্রুগড়, তিনি ব্যাঙ্কের চাকরি করতেন। প্রথমেই তিনি ছিলেন ক্লার্ক, তারপর হলেন অফিসার। বাবা কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হয়েছেন। ডিগবয় থেকে শুরু করে গৌহাটি, লামডিং, যোরহাট, শিলচর, ডিব্রুগড়। আমি মাত্র দু'বছর ছিলাম আসামে। বাবা স্বেচ্ছায় বদলি নিয়ে চলে আসে কলকাতায়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলাম আমার জন্যই বদলি নিয়েছেন। বাবা অসমীয়া ভাষা মাতৃভাষার মতো আয়ত্ব করেছেন। রাজনৈতিক আসামে দুটি নদী উপত্যকা আছে— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও বরাক উপত্যকা। বাঙালিরা ভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আসাম নামে পরিচিত। বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাধান্য বেশি। বাবা কর্মসূত্রে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও বরাক উপত্যকায় বসবাস করেছেন। তাই তার কথার মধ্যে অসমীয়া শব্দ ঢুকে যায়। কিন্তু বাবা তা মানতে চায় না।

বাবাও যুক্তি দেখান 'আই' শব্দের মানে অসমীয়াতে মাকে বোঝায়, সিলেটে গ্রামের মানুষ মাকে 'আই' বলে এবং বাঙালির দেবী মনসাকে 'আই মনসা' বলে অর্থাৎ মা মনসা। বাবার তিন রকমের ভাষার সম্মুখিন হতে হয়— এক হল অসমীয়া ভাষা, দুই হল— বাংলার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা এক জগাখিচুড়ি, যা কারো মাতৃভাষা নয়। ঢাকাই, সিলেটি, চাঁটগাইয়া, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারো নয়। এমনকি কলকাতারও নয়। কলকাতায় ঢাকার প্রতাপ বেশি, সিলেটি হল তিন নম্বরে। ''আর তিনে সিলেটির খুব দুরবস্থা, রামেও মারে রাবনেও মারে। অসমিয়াদের কাছে সব কন্দলের ঘটি হল সিলেটি, বরাকের মানুষ। স্বাধীনতার আগে যখন পুরো সিলেট আসাম রাজ্যে তখন তো বাঙালির আধিপত্য ছিল এক চেটিয়া। সিলেটি প্রাধান্য ছিল আসামের রাজধানী শিলং-এ, গৌহাটিতেও আসামের সংখ্যাগুরু হওয়ার প্রবল দাবিদার সিলেটকে পরিকল্পিত চক্রান্ত করে দিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানের হাতে গণভোটের প্রহসনে। আর তার পরই আসামের রাজ্যপাল, সাংবিধানিক প্রধান আকবর হায়দরি বলেন, ''যাক বাঙালি আর ক্ষমতার ধারে কাছে রইল না। এর আগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈও আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, আসাম অসমিয়ার। ব্যথিত মহাত্মাজি একথা শুনে আক্ষেপ করে বলেন, আসাম যদি অসমিয়ার ভারত তবে কার।''[২৮] এই সব পরিস্থিতির কথা শুনে বাবা রাগের মাথায় বলে যদি বাঙালিরা বিদেশি হয় তাহলে অসমীয়ারাও তো বিদেশি। অসমীয়ারা এসেছে ব্রহ্মদেশ থাই দেশ থেকে।

দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকলেও কলকাতার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। তবে মামার বাড়ি শিলচরের প্রতি একটা টান ছিল। আমার ছোট মামার বাড়ি বরাক উপত্যকার এক গ্রামে সেখানে আমার দাদু-দিদিমা বাস করতো। বাবার বাড়ি ছিল বাজারিছড়া গ্রামে, বাড়ি বলতে বোঝায় পরের জমিতে তাঁবু,

শন বাঁশের বাড়ি। বাবার কোনো স্থায়ী আস্থানা হয় নি আসামে। ''বাবার জন্ম দেশ ভাগের দুবছর পর, বাবা কিন্তু উদ্বাস্তু নয়। যদিও বাবার পৈত্রিক বাড়ি সিলেটের পাড়া গাঁয়ে। গ্রামের নাম রাউলি, পরগণা, ছাতক।''[২৯] বাবার দাদুও চাকরি করতো মেদলি চা বাগানে, বর্তমান নাম হয়েছে শিপানজুরী ভ্যালী টি এস্টেট। আর আমার ঠাকুরদা কিছু করতেন না, তাই তার কোন বাড়িঘর ছিল না। ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়ে দিয়েছেন জীবন। তবে আমার বাবা ঠাকুরদার এই আচরণের কারণ বলতে পারেননি। কিন্তু মজার ছলে বলেছে— ''তার বাবা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাঙালি ছিলেন। তিনি যেরকম বলেছেন, হুবহু তেমন, তৈলঢালা স্নিগ্ধতনু নিদ্রারসে ভরা, মাথায় ছোট বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।''[৩০]

আমার ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পর দুঃস্বপ্নের ডাকে পড়াশুনা ছেড়ে দিই। মনি হাজারিকা আমার রুমমেট, সে আসামের মেয়ে আমাকে অসমীয়া ভাষা শেখায়। এক বছর নষ্ট করে পরের বছর পাশ করে কলকাতায় ফিরে আসি এবং চাকরিও পেয়ে যাই। কিন্তু কলকাতাতে মন বসে না আবার ব্যাঙ্গালোরে যাই। আবার চাকরি করি। দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করেছি কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট হিসেব করেছি। অবশেষে পাঞ্জাবি ছেলে কৃপালকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলি।

বাবার কলকাতায় আসার কারণ হল— ''যখন শুনল ছাত্রনেতাদের সঙ্গে অ্যাকর্ড হয়েছে রাজীব গান্ধীর, বাবার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সমঝোতার শর্তে ২৪ মার্চ ১৯৭১ এর পর যারাই আসামে এসেছে সবাই বিদেশি।''[৩১] অসমীয়ারা বলে— ''খেদিব লাগিব মানে, তাড়াতেই হবে।''[৩২] কিন্তু বাঙালিরা বলে, ''বুঝলাম তো, যাইতাম কৈ। কোথায় বিতাড়ন। বাংলাদেশ নেবে না এক পিসও, ধাক্কা দিলেও নেবে না।''[৩৩] বাবা কলকাতায় আসার পর শুধু ঠিকানা যোগাড় করেছে যেমন প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, অফিসের আইডি কার্ড, রেশন

কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, আধার কার্ড। প্যান কার্ড ছাড়া সবগুলিতেই ঠিকানা লেখা আছে। ব্যাঙ্কের ডিগবয় শাখার ম্যানেজার কাকতি বাবু ফর্ম ফিলাপ করতে বলেছিল— বাবাকে, কিন্তু বাবার স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। তাই বাবা তার মাসির বাড়ি লক্ষ্মীপুরের ঠিকানা দেয়। বাবার এক সহপাঠী ও সহকর্মী আই লোরেন্দ্র সিং। তারা দু'জনেই শিলচর কাছাড় কলেজে বি.কম. পড়াশুনা করেছে। লোরেন্দ্র কাকু লক্ষ্মীপুরের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। বাবার ইচ্ছে হলো লক্ষ্মীপুরে কিছু জমি কেনার। পরে দুই বন্ধু মিলে এক বিঘা জমি কেনে। শহর থেকে কিছুটা দূরে বরাক নদীর পারে। নরুদ্দিনের পিসিমা ছাড়া আর কেউ নেই, যে জমিটুকু ছিল তাও তার পিসিমার। নরুদ্দিনের কোন স্থায়ী ঠিকানা ছিল না বলে তার কোন চাকরি হয়নি। তাই এখানে অসমীয়া ছাড়া সবাই বিদেশি। সবার পি.আর.সি. থাকতে হবে, পি.আর.সি. মানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট অর্থাৎ স্থায়ী ঠিকানার প্রশংসাপত্র। আমিও বাবার সঙ্গে সায়দেই যে শিলচরে চলে আসব। মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে লক্ষ্মীপুরের বাবার কেনা জায়গা ও জন্মস্থানে ঘুরে আসব এবং আমারও জন্মস্থান।

অবশেষে শিলচরে থাকবো ভেবে কৃপালকে ছেড়ে দিই। এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি সিলেটি ছেলেকে বিয়ে করবো। শিলচরের দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েও দূরে সরে এসেছে। পরে সুমিতকে পছন্দ করে। সুমিতও বিয়ে করতে রাজি। তার মধ্যে একটা কথা বলল এন.আর.সি লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন এন.আর.সি. নেই। এন.আর.সি না থাকায় বিবাহ বিষয়ে চিন্তিত হয় সুমিত।

আমার বাবা ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু আসামের নাগরিকত্ব পাচ্ছেন না। ১৯৫১-র পর আর নবায়ন হয়নি। এখন ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১-র ২৪ মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। এর পরের হলে বিদেশি বলে ঘোষিত হবে। এন.আর.সি. কথা

বলে বাঙালিদের ভয় দেখানো, আর তাড়ানোর চেষ্টা। ভাতে মারার ও জানে মারার প্রকল্প। ইতিমধ্যে লিগ্যাসি ডাটা না থাকায় দু-সাতজন চাষি আত্মহত্যা করেছে। এন.আর.সি. হয়ে গেলে সুমিতের সঙ্গে আর বিয়ে নিয়ে কোনো বাধা থাকবে না। শেষ পর্যন্ত এন.আর.সি. হয়নি বলে সে আর বিয়ে করতে রাজি নয়।

বাবার কথা জমি বরাক নদী নিয়ে যায়। বাবা রিটায়ার করে কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ি বিক্রি করে শিলচরে রামনগরে নদীর পারে চারকাঠা জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে সেখানে থাকে। আর সুমিত এন.আর.সি. ছাড়াই আমাকে বিয়ে করে। আর আমিও ব্যাঙ্গালোরের চাকরি ছেড়ে দিই।

এই গল্পে দেখা যায় আমার বাবা স্বদেশকে কত ভালোবাসে, এই ভালোবাসার টানেই রিটায়ার্ট হয়ে আবার আসামে ফিরে আসে। এখানে অনেক আবেগ কাজ করেছে। আসাম ভারতের একটি রাজ্য তবুও কত সমস্যার সম্মুখিন হতে হয় বাঙালি নাগরিকের মনে হয় যেন ভারতের নাগরিকই নয় আসামের বাঙালিরা। কারণ আসামে যে ভারতেরই অর্ন্তভুক্ত রাজ্য সেটা মনে করছে না। আইন শুধু আসামের কেন হবে, আইন হবে সমস্ত ভারতের।

'তামার টাট' গল্পটি পি.আর.সি. ও এন.আর.সি. উপর ভিত্তি করে রচনা করে রণবীর পুরকায়স্থ। শেখর কাকু শিলচরের বিখ্যাত মানুষ, তার গায়ের রঙ কালো। তবে তার হাসি খুব মিষ্টি কথা বলে কম। তিনি গল্প ও উপন্যাস লেখেন। তিনি গল্প লিখতো চিত্রনাট্যের আঙ্গিকে। বাবার সঙ্গে শেখর কাকুর সম্পর্ক ভালো ছিল। তাই শেখর কাকু কান্তার বাবাকে বলে,

''— দেখে নিও নির্বাসদা, আমি একদিন হলিউড চলে যাব। তোমাদের ঐ পঞ্চম সিং এর গ্যারেজের কাজ আমার নয়।''[৩৪] কান্তার বাবা শেখর কাকুর উপন্যাস পড়ে দেশ ভাগের যন্ত্রণা অনুভব করে। আসামের কাটলিছড়া ধলাইমলাই

গ্রামে এক সময় বাড়ি ছিল। শিলচরে থাকত যখন ঠাকুরদা মারা গেল, তার বাবা কাকা সবাই আলদা হয়ে গেল। কান্তার বাবা হয়ে গেল ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি।

নির্বাসের মেয়ে কান্তা লস্কর বি.এ. পাস করেছে কাছাড় কলেজ থেকে এবং এম.এ পাস করেছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আসাম টেট পরীক্ষায় পাস করেছে তবে পি.আর.সি. না থাকায় চাকরি হয়নি। তাই বাবার সঙ্গে রাগ করে বলে, ''— একটা পি.আর.সি. জোগাড় করতে পার না। লিগ্যাসি ডাটা নেই কারো। কোন দেশের নাগরিক তুমি বাবা?''[৩৫] আর এই নিয়ে সব সময় বাবার সঙ্গে কথা বলে। অনিকেত গোস্বামী এম.এ. পাস করেছে পলসাইন্সে। এখন 'ল' পড়বে বলে ভর্তি হয়েছে শেখর কাকু ও কান্তার বাবা দুজনেই অবসর নিয়েছে এবং অসুস্থ শরীর। কান্তার বাবা সিনেমা বিষয়ে কিছু বোঝে না তবে শেখর কাকুকে গল্প লিখতে বলে। বলে, ''— তুমি লেখো শেখরদা। আমি প্লট দেব।''[৩৬] কান্তা একটি সাইবার কাফে চালায় এবং তার সঙ্গে জেরক্স মেশিন আছে। এসবের মালিক হল কুঞ্জ সিং। তাকে কান্তা কুঞ্জকাকু বলে ডাকে। কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো জুলুম নেই। তাই কুঞ্জকাকু বলে, ''— আমি কম্যুনিস্ট পরিবারের ছেলে। শ্রমিক দরদি।''[৩৭] ইদানিং জেরক্স এর রমরমা বাজার, এন.আর.সি.-র সাপোর্টিং ডাটা, আর লিগ্যাসি ডাটা প্রিন্টিং-এ পাতা প্রতি দশ টাকা।

অনিকেত গোস্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয় কান্তার। তবে কান্তার এখানে আসে অনিকেত জেরক্স করাতে। তার চিন্তা ভাবনা ছিল সূক্ষ্ম। অনিকেত কান্তাকে পি.আর.সি. ও এন.আর.সি. না থাকলে ভবিষ্যতে কি হবে তা জানায় ''— চাকরি পাবে না। জমি কিনতে পারবে না। ছেলে মেয়ে স্কুলে কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।''[৩৮] অনিকেতকে কান্তা বলে, ''— তুমি এতো ভাবছ কেন বলতো? আমার নাগরিকত্ব নেই তার জন্য অতিরিক্ত কোন কাঠখড় পোড়াতে পারব না। আর তোমার প্রবলেমটা কোথায়, তোমাকে তো আমি বিয়েও করব না যে স্ত্রীর

আলাদা নাগরিকত্বই চাই।”[৩৯] ১৯৬১ সালে ১৯শে মে থেকে জেগেছিল বাঙালি তেমনি এন.আর.সি-র প্রহসন নিয়েও জাগবে বাঙালি। তামার টাট আর পাথরের ফলক জোড়া দিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে না আমাদের।

রণবীর পুরকায়স্থের রচিত ‘চিরিকন্যা’ গল্পটি। এই গল্পের চরিত্র দয়াময়ী পনেরো বছরের পঙ্গুত্বের নিরাময় জোর পেয়েছে শিবলির কাছ থেকে। দয়াময়ী শিবলিকে বলে যদি পারিস, তবে জুড়েদে ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ, কলকাতার সঙ্গে। শিবলির আর এক নামকরণ করেন। শিবলি নদীতে বাঁশের চালি বেয়ে চলে যেত লক্ষ্মীপুর। দয়াময়ী পোদ্দার, তার স্বামী সমর পোদ্দার। দয়াময়ীর ছোট ভাই মনোতোষ। দয়াময়ী কলকাতা ছেড়ে যায়নি কোথাও। শিবলি হলো দয়াময়ীর ছোট বোন, শিবলির দেশের মানুষ কথা বলে বাংলায়। ‘‘সে শিমকে বলে উরি, হিঞ্চেকে বলে হেলাইঞ্চা, ডাটাকে বলে ডেঙ্গা, কুমড়োকে বলে লাউ, মোচাকে বলে থোড়।”[৪০] এই সব বাংলা কথা শুনে সমর পোদ্দারের বন্ধু বাসুদেবও অবাক হয়। দয়াময়ীর অসুখ সারাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে।

‘রূপকথার মহাপ্রস্থান’ গল্পটি ‘আরম্ভ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রথমে। এই গল্পটি গ্রাম ও শহরকে নিয়ে লেখা। উৎপলেন্দু পুরকায়স্থের দু’বছরের ভুটিয়া কুকুর ছিল, নাম রেখেছিল গাট্টা। চাকরি সূত্রে উৎপলেন্দু কলকাতায় চলে আসে, তাতে গাট্টার মন খারাপ হয়। গাট্টা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়, কিছুদিন পর মারা যায়। গাট্টার মৃত্যুর জন্য উৎপলেন্দু শোক প্রকাশ করে। দীর্ঘদিন গ্রামে ফেরেনি। উৎপলেন্দুর সংসারে চারজন সদস্য ছিল। উৎপলেন্দুর স্ত্রী সুষমা শিলচর শহরের মেয়ে। উৎপলেন্দু বাধ্য হয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে দেড় হাজার বর্গফুটের। সুষমা শ্বশুর, শাশুড়ি ও দেওরের জন্য দু’খানা ঘর আলাদা করে রেখেছে। সুষমার শ্বশুড় বাড়ি আসামের করিমগঞ্জ জেলার কলকলিঘাট। শ্বশুড়, শাশুড়ি ও দেওর পণ করেছে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবে না। কিন্তু তীর্থ দর্শনে আসে শ্বশুড়, শাশুড়ি। কালীঘাট,

বেলুড়মঠ, দক্ষিণেশ্বর স্থানে বেড়াতে আসে। দেওর বিমলেন্দু পুরকায়স্থও মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে।

উৎপলেন্দুর বাবা শরদিন্দু পুরকায়স্থ কলকাতায় এসেই বলেন হাতিবাগান থেকে কুকুরের বাচ্চা কিনবেন। উৎপলেন্দুর আপত্তি ছিল। উৎপলেন্দু বলে, ''— গাট্টার বিকল্প হয় না। আর কুকুর নয়।''[৪১] কারণ গাট্টার জন্য তাদের মন এখনও খারাপ লাগে। তাই আর কুকুর কিনতে চান না। তাই নাগের বাজাররথের মেলা থেকে ফুল গাছ, ঝাউ গাছ, পাতাবাহার কিনে আসে। একটি নকল কলকলিঘাটের পরিবেশ তৈরি করে টবের বারান্দায়।

শরদিন্দুর বড় শখ ছিল ছেলে ও মেয়ে সন্তানের পিতা হওয়ার। কিন্তু তার দুই ছেলে হল। মেয়ে সন্তানের আশা অপূর্ণ থেকে গেল। তার এখন ভয়, দুই ছেলে যদি আলাদা আলাদা বাড়ি করে। স্ত্রী মমতাময়ী স্বামীকে বোঝায় কিন্তু সে বোঝ মানে না, তার ভিতরে একটা মানসিক চাপ থেকেই যায়। বলেছেন, ''— যদি হয়? আমরা বেঁচে থাকতেই যদি হয়?[৪২] শরদিন্দুর আরও ভয় যদি তারা পিতা মাতাকে আলাদা করে দেয়। শরদিন্দু মমতাময়ী ছাড়া জীবন ভাবতেই পারছে না। পুত্রবধূ শেখায় শ্বশুরকে, ''— মহানগর মানেই দূষণ। সামগ্রিক দূষণ বাতাস দূষণ জল দূষণ যাক দূষণ দৃশ্য দূষণ। সব কিছুতেই দূষণ।''[৪৩] পরে বিমলেন্দুও বৌদিকে বলে সেও কলকাতাতে থাকবে, বৌদিও রাজি হয়। কলকাতায় থাকার ফলে তার চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে তার স্ত্রীকে সামলে বলে, ''— দেখ, কলকলিতে আমি ছিলাম ব্যক্তিত্ব। পুরকায়স্থ বাড়ির বড় ছেলে। আমাকে সবাই চেনে। জন্মসূত্রে অর্জিত অধিকার ছিল। আর এই মহানগর শহরতলিতে আমি একটি সংখ্যামাত্র।''[৪৪]

দেড় বছরের হাসনরাজা ভাইপো ফোনে বিমলেন্দু কাকাকে স্পষ্ট ডাকতে

পারে। তাই নিয়ে কাকার খুব গর্ব হয়। কারণ উৎপলেন্দু ও বিমলেন্দুরা সিলেটি ভাষায় কথা বলে। এই ভাষা নিয়ে অনেকে হাস্য তামাসা করে কিন্তু আজ ভাইপো কলকাতায় থেকে স্পষ্ট মান্য চলিত ভাষা শিখেছে। সিলেটি ভাষা শুনে অনেকেই বলে দিতে পারে কোন জায়গার বাসিন্দা। অনেকের প্রশ্ন,

"— আপনাদের বাড়ি আসামে?

— আপনারা ত্রিপুরায় থাকেন?

— আপনারা তো বাঙালি?"[৪৫]

বিমলেন্দু ভাইপোর সঙ্গে ফোন করে বলে। গ্রাম থেকে নিয়ে আসবে বিরুণ চাল, বাঁশের চোঙে আখের গুড়, ঢেঁকি শাক, লাইপাতা ইত্যাদি। এই সব গ্রামের চিত্র তুলে ধরেছে ভাইপোর সাথে।

কুকুর সম্পর্কে হাসন জানতে চেয়েছে কাকা বিমলেন্দুর কাছে। বিমলেন্দু বলে কুকুর খারাপ নয়, এরা প্রভুভক্ত হয় এবং সত্যবাদী হয়। মহাভারতের গল্পে ধর্মরাজ কুকুরের কথা আছে। আবার মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদীর সঙ্গে ছিল। হাসন তাদের প্রতিবেশী অনুপিসির কাছ থেকে একটি কুকুর বাচ্চা নিতে চেয়েছে, তার নাম রাখে ধর্ম।

দুই ভাইয়ের মধ্যে গ্রাম ও কলকাতার শহরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু উৎপলেন্দু শহর সম্পর্কে বলেছে—

"— গ্রামে যেতে কী আমারই ইচ্ছে হয় না রে ভাই। কিন্তু ডাক্তারী ফেসিলিটি পাব না, যতই নার্সিংহোম হোক সুপার স্পেশালিটি পাব না। ভাল জল পাব না। হাসন রাজা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে হোস্টেলে দিতে হবে। কলকাতা থাকলে বাড়ি থেকে কাজ করতে পারবে।"[৪৬] কলকাতার মহানাগরিক জীবনে দেখা যায়

প্রতিবেশীর হিংসা, চার পাশে নানা ধরনের দূষণ। কিন্তু মহানাগরিক জীবনে এই সব অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে দূষণ ছাড়া আর বাঁচা যাবে না, খাটি দুধ খেলে এখন আর পেটে হজম হয় না। ভেজালের মধ্যে পড়ে জীবনটাই ভেজাল হয়ে গেছে, এখন আর অন্য পরিবেশে মানিয়ে চলতে পারবো না। একজন গ্রাম থেকে দাদাকে হাতছানি দিচ্ছে শহর থেকে ফিরে আসার জন্য কিন্তু দাদা ভাইয়ে ডাকে সাড়া দিতে পারছে না। দাদা বৌদি ভাইপো এখন মহানগরের সব যন্ত্রণা সহ্য করে নিয়েছে। দাদা বৌদি দিব্যি এখন ঘুমাতে পারে। ভাইপো রাত জেগে মনোযোগ দিয়ে ট্রিপল আইটির পড়া তৈরি করছে।

বিমলেন্দু শহর সম্পর্কে গভীর ভাবনা। তাই দাদা তাকে বোঝায় যে শহরে কোন কিছু স্থায়ী নয়। সব কিছু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে। আজ যে কুকুরের কথা হচ্ছে কাল তা নাও থাকতে পারে। হয়তো কুকুরেরা যাবে মহাপ্রস্থানের পথে। বিমলেন্দু রূপকথার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দাদাকে দেখছে, দাদাকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে তার প্রিয় কুকুর গাট্টা।

প্রেম বিষয়ক হল 'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকতা'। এই গল্পটি 'সকালবেলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তন্ময় মল্লিকার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কে পুরোনো হয়েছে। তাদের সম্পর্কের মধ্যে কি ঘটে ছিল তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তন্ময় মণিপুর, জনপথ থানলন, একটা চার্চের গায়ে ডাকঘরে চাকরি করে। তবে বেশি কাজ না থাকায় শুধু রান্না করা, খাওয়া, ঘুমানো আর চিঠি লেখা। তবে তন্ময় শিলচরে না গেলেও শিলচরের শিখা দত্ত ইম্ফল জিপিওতে কাজ করে তার কাছ থেকে জেনেছে। মুকুন্দ ভট্টাচার্যের পাড়ায় শিখার বাড়ি। শিখা ভেবে ছিল আমি সিলেটি, আমার সঙ্গে সিলেটি ভাষায় কথা বলেছে।

মাঝে মাঝে তাদের চিঠি দেওয়া নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। দু'জনের মধ্যে অভিমান হয়। তন্ময়-ই অভিমান ভাঙে। মল্লিকার মনে কোন জটিলতা বা কুটিলতা নেই। তাই তন্ময় তাকে বড় সড় ফাঁকির স্তোত্র বাক্যে ভুলিয়েছে। একথাও বলেছে চাকরি ছেড়ে এবার হাইলাকান্দি চলে আসবে মল্লিকার কাছে। মল্লিকা তার সব কথা সত্য বলে মেনে নেয়।

তন্ময় ডিমাপুরে বাসে কয়েক ঘন্টায় পৌঁছাতে পারতো। তিনি তা না করে শিলচর হয়ে ট্রেনে ছত্রিশটা পাহাড়ি সুড়ঙ্গ পার হয়ে যাবে লামডিং, লামডিং হয়ে ডিমাপুর যাবে। এর জন্য দুটি কারণ আছে— এক হল হাইলাকান্দি লক্ষ্মীবাজারের লক্ষ্মীদেবীর সন্দর্শন, দুই, এই দশদিনে শিলচর হাইলাকান্দি করিমগঞ্জে কোথাও যদি একটা মাস্টারির চাকরি জুটে যায়। মল্লিকাকে পাশে পাওয়ার বাসনা। আর অন্যদিকে মারিয়া শিখার যে সম্পর্ক সেটাও ছাড়তে পারবে।

তন্ময় শিলচর ভ্রমণে এসে তার চিন্তা ধারার বদল ঘটে। শিলচর এমন সুন্দর তা আগে জানতই না। মল্লিকাও তা জানায়নি এসব কথা। ''জিরি চিরি মধুরা ধলেশ্বরী সোনাই রুকমিনি এবং ওই দূরের জাটিঙ্গা, দামছড়া। বড়াই পাহাড় থেকে বের হওয়া বরাক সুন্দরীর আঁকা বাঁকা রূপ। কিছুদূর করিমগঞ্জেও গিয়েই আখের রসের মতো মিঠে পানির নদী কুশিয়ারা। ওদেশে আখের অন্য নাম কুশিয়ার। ওপার বাংলাদেশে গিয়েই নৃত্যপরা নদীর নাম সুরমা। সুরমা থেকে ব্রহ্মপুত্র যমুনা গঙ্গা হয়ে বঙ্গোপসাগর। তার মানে হুগলি নদীতেও ধলেশ্বরীর জলস্পর্শ আছে।''[৪৭]

তন্ময় মল্লিকার কাছে দেখা করতে গেল না, নানা অজুহাত দেখিয়ে। একবার তন্ময় হাইলাকান্দি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হয়নি তখন মল্লিকা ছুটিতে

ছিলেন। তন্ময়ের কথা শুনে বরাকের লোক বুঝতে পারে যে কলকাতা থেকে এসেছে। থালি গ্রামের মধুমঙ্গল বর্মনের মেয়ে কাঞ্চনীর সঙ্গেও পরিচয় হয়।

তন্ময় ও মল্লিকা এরা এখন দ্বিধা দ্বন্দ্বে দিন কাটাচ্ছে। তন্ময় বিয়ের কথা বললে মল্লিকা এড়িয়ে যায়। বেকার ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি নয়। আর তন্ময়কে বোকা ভাবে। আর তন্ময় মল্লিকাকে চিঠি লেখে নানা রমণী সম্পর্কে যাতে তার ঈর্ষা জাগে মনে। এই ভাবে তন্ময় ও মল্লিকার প্রেমের কাহিনির বিস্তার লাভ করে।

'গোলা গুল্লি' গল্পে গুল্লি মেয়েটি গোলাকে দেখে মুচকি হাসে। তবে তার মধ্যে কোনো কৌশল ছিল না, হাসির কথাতেই হাসত। আর গোলা গুল্লিকে দেখলেই পাল্টে যায় তার আচরণ গুল্লিকে দেখে গোলা তার বন্ধুদেরকে নিয়ে বই খাতা আর সিমেন্টের বেদি বাজিয়ে গায় অশ্লীল গান,

''নান্টু ঘটকের কথা শুইন্যা
অল্প বয়সে করলাম বিয়া ...''[৪৮]

এই সব গান শুনে গোলার প্রতি রাগ করে। গুল্লি সম্পর্কে কলেজে সবাই জানে সে খুব রাগি। গুল্লির খুব ইচ্ছে পুলিশের চাকরি করবে, কারণ ছোটবেলা থেকেই পুলিশ দেখে বড় হয়েছে। তাদের বাড়ি ছিল রংপুর থানার কাছে এবং বাড়িতে একজন পুলিশের চাকরি করে। গুল্লি তাদের গান শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে আর কেউ শোনায় না। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে তাদের আড্ডায় ঘুরে বেড়ায়। তাই সে বলে— ''জেলের চাক্কি ঘুরিয়ে ছাড়তাম গান শুনলে।''[৪৯] গুল্লি আগবাড়িয়ে তাদের শাস্তি দিতে চায়। কারণ সেও গান শুনবে এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। তার ইচ্ছে গোলাকে শাস্তি দেওয়া, শাস্তি দিয়ে নিজে আনন্দ উপভোগ করা। গোলাকে ধরার জন্য রংপুর থানার

এ.এস.আই. বরঠাকুরকে নিয়ে আসে। কিন্তু গোলা না ধরতে পেয়ে গুল্লি বলে— ''— আমি ছাড়ব না কাকু।''[৫০] ফেরার পথে বরাক ব্রিজের নীচে বরঠাকুর দেখতে পায় অনেক লোকের ভিড়। আবার ভিড় দেখলেই বরঠাকুরের চোখ চকচক করতে থাকে লোভলালসায় কিছু ফায়দা লাভের জন্য, তা না হলে অন্তত ধমকাধমকি করতে পারবে এই আশায়।

মৃন্ময়ী নাথ দীপনারায়ণ নন্দ মজুমদার এরা একে অপরকে ভালোবাসে। মৃন্ময়ীর ও কাকা দীপনারায়ণকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। কাকাও তাদের এই সম্পর্ককে মেনে নিয়েছে। তাই কাকু বলে, ''— ছি ছি, দু'দিন পরে জামাই হবে লরা, আমি মারব ডাণ্ডার বাড়ি?''[৫১] নিজের ছেলে দীপনারায়ণ ডিব্রুগড়ে অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে যায়। ফিরে এসে বরঠাকুরকে প্রণাম করে। কাকু মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়। পুলিশ কাকুর অনুমতি নিয়ে দুজনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়।

দীপনারায়ণ পালসারকে চাচা বলে, তার পালসারকে সে যত্ন করে, সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, বলতে গেলে পুত্রস্নেহ করে। তাই সে বলে ''জিও মেরে লাল''। কিন্তু মৃন্ময়ীর পছন্দ হল চার চাকার গাড়ি। দীপনারায়ণ মৃন্ময়ীকে বলে অন্য যত ধরনের গাড়িই আনোনা কেন তার গাড়ির মত হবে না। গাড়ি সম্পর্কে বলে, ''— চার চাকার এমন অপরিসীম শক্তি আর সৌন্দর্য পাবে না। একদম বাঘের বাচ্চা আমার চাচা।''[৫২]

দীপনারায়ণ উদার মনের মানুষ। সে অনেককে সাহায্য করছে এবং সাহায্য করতে পারলে মনে শান্তি পায়। তাই সে বলে— ''উপকার করলে ভাল লাগে। লাগে না বলো। তুমি রেবতীকেও দাও, যা চায় দিও। টাকা না থাকলে বরঠাকুর কাকুর কাছ থেকে আনিয়ে নেব আবার।''[৫৩] তার স্ত্রী মৃন্ময়ীও রেবতীকে অনেক সাহায্য করেছে। হেমন্ত হাজরিকা দোকান করার জন্য টাকা দিয়েছিল

দীপনারায়ণ। স্ত্রীর প্রশ্নে দীপনারায়ণ বলে, ''— এক লাখ। সুশান্তদা আশুদাই দিয়েছে বেশি। সবাই এক মাসের বেতন দিয়েছি। ভাইটি বলেছে ফেরৎ দেবে। ধুর কে নেবে ফেরত তার টাকা।''[৫৪]

দীপনারায়ণ আর মৃন্ময়ী এরা একে অপরকে ভালোবাসে, তাই মৃন্ময়ী বলে ''এরকম পাগলামি নিয়েই তো আমার গোলা।''[৫৫] বকুল চন্দ্র ব্যবর্তার বয়স হওয়ায় আর কাজ করতে পারে না। তার ছেলে পুরুষচন্দ্র সেও একজন হাবা গোবা। একটি রাস্তায় বকুল চন্দ্র একটা ম্যাটাডোর এসে মেরে দিয়ে যায়। আর অন্য দিকে দীপনারায়ণ ও মৃন্ময়ী বাইক নিয়ে ধান খেতে পড়ে যায়। আর ঐ অঞ্চলের ধ্যাঙাড়ে বাহিনী তাকে ধরে মারধোর করে। কারণ তার দোষ নির্ণয় করে, ভয় দেখিয়ে টাকা রোজগার করা। ধ্যাঙারে বাহিনী বলে, ''— তোমরা মেরেছ, ঐ লোকটা বাইক দিয়ে ধাক্কা দিয়েছে বকুলকাইকে। এখন টাকা দাও চলে যাও।''[৫৬]

'জন্মান্তর' গল্পে দেখা যায় স্বরাজ চৌধুরীর ছেলে হল প্রজাপতি। ছেলেটি গিটার বাজায় ভালো। কিন্তু স্বরাজ চৌধুরীও কম্পোজার, স্বরাজের স্ত্রী গায়িকা। বলতে গেলে তাদের বাড়িতে গান বাজনার পরিবেশ রয়েছে। স্বরাজ চৌধুরী পরের স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ করে। তাঁর দু'ঘন্টা নিজস্ব সময় স্ত্রীর কাছে সঁপে দেয়। স্বরাজের আচরণ সব সময় তার স্ত্রী সহ্য করে না। তাই তাকে অনেক বাঁধা নিষেধ মানতে হয়। আর এই জন্যই তিনি ওয়াইলড হয়ে যান এবং বারমুখো হন। স্ত্রী বাড়িতে না থাকলে ফুলবাড়ির মেয়েটিকে দেখে সময় কাটান। এই সব দেখেও আশ মেটে না। তাই আবার ফিরে আসে বাড়িতে। তখন স্ত্রীর আলমারি খোলে সাজানো শাড়িতে হাত বোলায় মনে মনে অনুভব করে স্ত্রীর কোমল শরীর। শাড়িতে মুখ ঘষে, শোঁকে, ঘ্রাণ নেয়, পরশ করে। স্বরাজ এক বসন্তকালে বলেছিল স্ত্রীকে, ''— পুরুষরা যে এসব দেখলেই উত্তেজিত হয়, তোমরা হও না?

জকি, টমি হিলফিজার পুরুষ দেখলে শরীর কেমন করে না?"[৫৭] এখানে নিজের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। যে উত্তেজনা সুপ্ত থাকে তা দর্শনের ফলে প্রকাশ ঘটে। এটা স্বরাজের সংযমের অভাব রয়েছে। উত্তেজনা ও যে সংযমের মধ্যে ধরে রাখা যায় তার অভিজ্ঞতা নেই। তাই স্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছে।

স্বরাজ চৌধুরীর বাড়িতে কাজের মেয়ে হল কমলা। স্বরাজ একা বাড়িতে থাকাকালীন আসে তখন স্বরাজ কমলাকে এক কাপ চা করতে বলে। স্বরাজ কমলাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে নেয়। আবার বেশিক্ষণ এক নজরে তাকায় না যদি দেখে ফেলে। আবার যদি চমৎকার করে বলে, ''— এই লোকটা একা পেয়ে ...।"[৫৮] এই সব কথা স্বরাজ মনে মনে ভাবছে। আবার এও ভাবে কমলা মেয়ে খারাপ নয়, এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে না তার উপর বিশ্বাস আছে। প্রজার মা স্বামী স্বরাজ চৌধুরীকে সাবধান করে দিচ্ছে যাতে কমলার দিকে এই ভাবে দৃষ্টি না দেয়। স্বরাজ বলে— ''ধুৎ ও দেখবে নাকি আমার নয়নসুখ। ঠিক ঘুরিয়ে নেব, আমি বাবা ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি না, সাধু মানুষ।"[৫৯] স্বরাজ স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছে কিন্তু স্ত্রী অর্থাৎ প্রজার মা বলে, ''— তাকাবে না একদম বলে দিচ্ছি। চান্স পেলে তোমাদের হাতসুখ মুখসুখ হতে কতক্ষণ সে আমার জানা আছে। বেটা ছেলেদের কোন বাছবিচার নেই।"[৬০] স্ত্রী হয়ে স্বামীকে সামলানোর কাজ করছে।

স্বরাজ চৌধুরী আরেকটি দিক তুলে ধরেছেন তা হল বাংলা ভাষার প্রতি যে বাঙালির অবজ্ঞা। বাংলার যে কত কত সিরিয়েল আছে তা বাঙালিরা দেখে না, দেখে শুধু হিন্দি। পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর বাঙালি আছে তারা বাংলায় কথা বলে না, বাংলায় লেখে না। আর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস তার খবর কেউ রাখে না।

'একরাত্রি তাজমহলে' বিখ্যাত গল্পটি 'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা' গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়। তবে এর আগে এই গল্পটি 'শতক্রতু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পের প্রধান চরিত্র রামবাবু চাকরি থেকে অবসরকালীন সময়ে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা পেয়েছিল কিন্তু স্ত্রী লাবণ্যকে সম্পূর্ণ টাকার হিসেব দেননি। স্ত্রীকে হিসেব দিয়েছে পঞ্চাশের অর্ধেক পঁচিশ লাখ টাকা।

মঞ্জু অর্থাৎ কলঙ্ক স্যারকে অনেক শাকসব্জি দিত। আর স্যার তাকে পেয়ে খুব খুশি হতেন। একদিন স্যারকে মুড়ি খাওয়াবে। কিন্তু স্যার রামবাবু বলে, ''— নিন কী? বসো দুজনে মিলে খাই। এখন আর ফারাক নেই। তোমাকে আমাতে।''[৬১] রামবাবু মানুষকে ভালোবাসে ধর্মের বা ধর্মের ভিত্তিতে নয়, মানবিকতা বোধ থেকে। রামবাবু ও কলঙ্ক এক সঙ্গে মুড়ি খায় আর গল্প করে। গল্পের মধ্যে উঠে আসে নানা ধরনের গাছপালার কথা, মুক্ত পরিবেশের কথা। মঞ্জু তার মায়ের রান্নার কথা স্যারকে বলতেন। আর স্যার গ্রামের পরিবেশ মঞ্জুর কাছে শুনে আনন্দে মেতে থাকতেন।

রামবাবু এখন কলকাতা মহানাগরিক বাসিন্দা তাই গ্রামের পরিবেশ ভুলে গেলেন। সত্যনারায়ণের সিন্নি ভুলে গেলেন, ঝুলনের বুড়োকে কত দিন থেকে দেখছেন না তা মনো ব্যথার কথা বললেন। স্যার গ্রামে বহুরূপী দেখেছেন, শহরে এর অভাব রয়েছে। আর অন্যদিকে মঞ্জু থাকে গ্রামে। গ্রাম তার ভালো লাগে না। কারণ তার কাছে গ্রামে কোনো পরিবর্তন নেই, কোনো বৈচিত্র নেই, সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে সব একই রকম। আর শহর সব সময় পরিবর্তনশীল। সে পায়খানার পিট পরিষ্কারের কাজ করে। তাও সবার বাড়িতে করে না। যারা তাকে বিশ্বাস করে তাদের বাড়িতে করে। সে স্যার রামবাবুকে শাক-শব্জি, মাছ বিনামূল্যে দিয়ে দেয়। সে ঠেলাগাড়ি নিয়ে আসে কলকাতা শহরে শহর থেকে সুখের সরঞ্জাম গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে। স্যার ও মঞ্জু দুইজন দুই ধরনের মানসিকতা

ধরা পড়েছে, একজন হল গ্রামে থেকে শহরমুখী আর একজন শহরে থেকে গ্রামমুখী। মানুষ নিজের কাছে যা আছে তা ভালোলাগে না। মঞ্জু অনেক হাতের কাজ জানে। স্যুইচ নষ্ট হলে তা ঠিক করতে পারে, গিজারে জল গরম হচ্ছে না তা গরম করার ব্যবস্থা করে দিতে পারে, ইনভার্টার খারাপ হলে মেরামত করে দিতে পারে, ব্যাটারি চার্জ না হলে তাও ঠিক করে দিতে পারে। মঞ্জু আরও কাজের কথা বলে, ''— রাজমিস্ত্রির যোগালিগিরিও করি। ত্রিশ টাকা রোজ। শাটারিং, গাথনি, প্লাস্টারিং, মোজাইক, টাইলস সব লাগাতে পারি। সান্ত্রাস মিস্ত্রির কাজও পারি, কনসিল তারও ভরতে পারি, পাইপলাইনের কাজও জানি। জল কল ঠিক করি। পিওপি করি দেওয়ালে, শেড কার্ড দেখে ম্যাচিং রং ঠিক করি। ছাদে জলের টেঙ্ক ফিট করতে পারি, টুলু পাম্পে জল ওঠাতে পারি। পায়খানার চেম্বার করি, সাফাইও করি।''[৬২] রামবাবু মঞ্জুর বাড়িটা দেখে খুব পছন্দ হয়েছে এই রকম বাড়ি সে স্বপ্নে দেখেছে। তাই তাকে বলে বাড়িটা বিক্রি করবে কিনা। মঞ্জুর বাবা বাড়িটা বিক্রি করে চলে যাবে খানাকুল স্থানে। রামবাবু মঞ্জুকে বলে, ''— পাল্টাপাল্টি করলে হয় না? তুমি শহর ভালবাস নিউটাউনের ফ্ল্যাট দিয়ে দেবো তোমায়, এই বাড়ি আমার।''[৬৩] মঞ্জুর বাবার টাকা লাগবে তাই এই বদল করতে চাইবে না। মঞ্জুর ইচ্ছে থাকলেও হচ্ছে না কারণ তার বাবা একমত নন। তার বাবা সুদে টাকা খাটান। মঞ্জু তার গ্রামের বাড়িটি সাজিয়েছে তাজমহল। সেই তার তাজমহলে এক রাত থাকতে দিয়েছে মঞ্জু। এই তাজমহলে আরাম তুলতুলে বিছানা, দেয়াল জোড়া এলইডি স্ক্রিনের সঙ্গে মিউজিক সিস্টেম। নিজে হচ্ছে স্টার আনন্দ। রামবাবু ভাবছে মঞ্জুর বাড়ি কলকাতা থেকে এত দূরে বিদ্যুৎহীন এলাকায় এমন সুন্দর সাজিয়েছে। মঞ্জু কিভাবে তার ঘরটি সাজিয়েছে তা মনে মনে ভাবছে রামবাবু। ''রামবাবু অবাক, এই মনিটারই তো চুরি গেছিল অফিস থেকে। কফিমেকারটাও তো লাবণ্যর শ্যালক হিমবন্ত এনে দিয়েছিল দুবাই থেকে।

সাইড টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটাও চেনা, তার অফিসের। ঘষে ঘষে ওঠানো হয়েছে ব্যাঙ্কের নাম। ড্রেসিং টেবিলে কত কত লিপস্টিক আইলাইনার সুগন্ধি। একটা লেডিস ঘড়িও আছে গোল্ডেং ডায়েলের টাইটান, লাবণ্যর চুরি যাওয়া সামগ্রী এখন পড়ে অন্নপূর্ণা। কত কত শাড়ি অন্নপূর্ণার সব ডিজাইনার্স, গীতামাসির। সন্তোষের ঠেলা করে সারারাতের পরিশ্রমে সাজিয়েছে কলঙ্ক তার তাজমহল।”[৬৪]

তথ্যসূত্র :

১. 'কিচ্ছা', পৃঃ ১১২

২. একাদশের বাংলা নির্দেশিকা, পৃঃ ৩৮৬

৩. 'কিচ্ছা', পৃঃ ১১২

৪. তদেব, পৃঃ ১১৬

৫. 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', পৃঃ ১২৮৮

৬. 'ইচ্ছাকলি', পৃঃ ৩৭

৭. তদেব, পৃঃ ৩৮

৮. তদেব, পৃঃ ৩৮

৯. তদেব, পৃঃ ৩৮

১০. তদেব, পৃঃ ৩৯

১১. তদেব, পৃঃ ৪০

১২. তদেব, পৃঃ ৪২

১৩. তদেব, পৃঃ ৪২

১৪. তদেব, পৃঃ ৪৬

১৫. 'মামুলি অশান্তি', পৃঃ ১২৬

১৬. তদেব, পৃঃ ১২৯

১৭. তদেব, পৃঃ ১৩২

১৮. তদেব, পৃঃ ১৩২

১৯. তদেব, পৃঃ ১৩৩

২০. তদেব, পৃঃ ১৩৩

২১. তদেব, পৃঃ ১৩৩

২২. তদেব, পৃঃ ১৩৪-১৩৫

২৩. তদেব, পৃঃ ১৩৫

২৪. 'লেবুপাতা করমচা', পৃঃ ১১৭

২৫. তদেব, পৃঃ ১১৭

২৬. তদেব, পৃঃ ১১৭

২৭. তদেব, পৃঃ ১২৩

২৮. 'স্থায়ী ঠিকানা', পৃঃ ৫১

২৯. তদেব, পৃঃ ৫১

৩০. তদেব, পৃঃ ৫১

৩১. তদেব, পৃঃ ৫২

৩২. তদেব, পৃঃ ৫২

৩৩. তদেব, পৃঃ ৫২

৩৪. 'তামার টাট', পৃঃ ২২

৩৫. তদেব, পৃঃ ২৩

৩৬. তদেব, পৃঃ ২৩

৩৭. তদেব, পৃঃ ২৭

৩৮. তদেব, পৃঃ ৩০

৩৯. তদেব, পৃঃ ৩২

৪০. 'চিরিকন্যা', পৃঃ ১৭

৪১. 'রূপকথার মহাপ্রস্থান', পৃঃ ৪৮

৪২. তদেব, পৃঃ ৪৯

৪৩. তদেব, পৃঃ ৫১

৪৪. তদেব, পৃঃ ৫৪

৪৫. তদেব, পৃঃ ৫৮-৫৯

৪৬. তদেব, পৃঃ ৬৫-৬৬

৪৭. 'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা', পৃঃ ১৫

৪৮. 'গোলা গুল্লি', পৃঃ ৩৪

৪৯. তদেব, পৃঃ ৩৬

৫০. তদেব, পৃঃ ৩৬

৫১. তদেব, পৃঃ ৩৯

৫২. তদেব, পৃঃ ৪১

৫৩. তদেব, পৃঃ ৪৫

৫৪. তদেব, পৃঃ ৪৫

৫৫. তদেব, পৃঃ ৪৮

৫৬. তদেব, পৃঃ ৪৭

৫৭. ‘জন্মান্তর’, পৃঃ ১৫৩

৫৮. তদেব, পৃঃ ১৫৩

৫৯. তদেব, পৃঃ ১৫৪

৬০. তদেব, পৃঃ ১৫৪

৬১. ‘একরাত্রি তাজমহলে’, পৃঃ ১৪৪

৬২. তদেব, পৃঃ ১৪৮

৬৩. তদেব, পৃঃ ১৪৯

৬৪. তদেব, পৃঃ ১৫১